ইসলামী শাসনব্যবস্থাঃ
মানবতার কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানা

মাওলানা শেখ মু. ফজলে বারী মাসউদ

বিশ্ব মানবতার মর্যাদা:

সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মহান আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন মানবজাতিকে। আল্লল্লাহ ছুবহানাহু তা'আলা মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

অর্থাৎ আমি বনী আদম বা মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছি।[১]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

অর্থাৎ আমি মানুষকে সর্বাধিক সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।[২]

রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: إن الله خلق آدم بيده

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে নিজ কুদরাতী হাতে সৃষ্টি করেছেন।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন : নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর বিশেষ সৌন্দর্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন।[৪]

এভাবে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় নানা ভঙ্গিমায় মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়ার যত সৃষ্টিকূল, প্রাণীর অপরূপতা, রং-বৈচিত্র, সবুজের সমারোহ, শস্য ফুলে হলুদের স্নীগ্ধতা, পাখির কলতান, কূলহীন সমুদ্র, নদীর জোয়ার-ভাটা, আগুন পানিসহ অবারিত নেয়ামতরাজী সবই মানুষের জন্য। বন্যপ্রাণীর প্রচণ্ড শক্তির দাপট; তাও মানুষের সামনে অবনত। এককথায় আল্লাহর অগণিত নেয়ামতরাজী সবই কেবল মানুষের জন্য। এসব কিছুর ওপরেই রয়েছে মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। এমনকি এ দুনিয়ার অস্তিত্ব টিকে থাকাও নির্ভর করে আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাদের ওপর।

মহান আল্লাহ সব কিছুর ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সবকিছুকে তার অনুগত করে দিয়েছেন এই শর্তে যে, মানুষ দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সকল সৃষ্টির পরিবর্তে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ইবাদত করবে, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে নিবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, দুনিয়ার মধ্যে মানবতার সম্মান প্রকৃত অর্থে নূন্যতম ভূলুণ্ঠিত হয়, কোন সৃষ্টিকূলের সামনে সামান্যতম মস্তক অবনত করতে হয়– এমন কোন বিধান ইসলাম মানুষের জন্য দেয়নি। বরং রসূল স. স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন :

إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله

অর্থাৎ যদি কিছু চাইতে হয় তো আল্লাহর কাছে চাও, যাদি সাহায্য চাইতে হয় তো আল্লাহর কাছে চাও।[৫]

এসব কিছুর সাথে সাথে তিনি এও ঘোষণা করেছেন, কোন সৃষ্টিকূলের দ্বারে নয়, একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা, সমগ্র জাহানের মালিক, মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে ছাড়া অন্য কোথাও, কোন শক্তি, কোন রথি মহা-রথি কারো সামনে নিতান্ত সামান্যতম মাথা নত করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে, সকল সৃষ্টির মাঝে চির উন্নত শির নিয়ে স্ব-সম্মানে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা হল, কোন সৃষ্টির সামনে কোন মানুষ যেকোনভাবে অবনত হবে– এ অধিকার আমার-আপনার, সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক কোন মানুষকে একেবারেই দেননি। কোনো মানুষের ওপর অন্যকোন মানুষ নিজের খেয়াল খুশিমত কর্তৃত্ব করবে–সে অধিকারটুকুও ইসলাম কাউকে দেয়নি। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূল সা. নিজে ঘোষণা করেন :

---

[১] সূরা বানী ইসরাঈল: ৭০
[২] সূরা আত তীন: ৪
[৩] আত-তাবাকাতুল কুবরা, সংকলক: মুহাম্মদ বিন সা'দ আয যুহরী।
[৪] বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬২২৭
[৫] তিরমিযী।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

অর্থাৎ হে লোক সকল! জেনে রাখ : তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা এক। কাজেই জেনে রেখ : অনারাব জাতির ওপর আরব জাতির মর্যাদাগত কোন প্রাধান্য নেই। আবার আরব জাতির উপর অনারবদের কোন প্রাধান্য নেই, শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের, কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোন প্রাধান্য নেই। হ্যাঁ, এ প্রাধান্য হতে পারে কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে।[৬]

মহান আল্লাহ প্রদত্ব এবং তাঁর রাসূল সা. ঘোষিত এ সম্মান বিশ্বমানবতার। এ অধিকার মানবজাতির জন্য চির নিবেদিত। এ সম্মানের বিপরীত দৃশ্য আমরা মেনে নিতে পারি না। এর বিপরীত বিশ্বব্যবস্থাকে আমরা আদৌ বরদাশত করতে পারি না, পারি না আমরা এর সাথে সহাবস্থান করতে।

ভূলুণ্ঠিত আজ বিশ্বমানবতা :

যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা সম্পর্কে ইসলাম এতকিছু বলেছে, তাদের সে মর্যাদা আজ কোথায়? দিকে দিকে আজ মানুষ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত আর শোষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মুখ খুলে তাদের আর্জিটুকু পেশ করার অধিকার পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে। মানুষকে গুলি করা হচ্ছে পাখির মত। আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, ইরাক, মিন্দানাও, দারফুর আরও কত জনপদ আজ পরিণত হয়েছে বোমার স্তুপে। মায়ের কোলে অশ্রুসজল ছোট্ট শিশুর বাঁচার জন্য আত্মচিৎকারের সচিত্র প্রতিবেদন হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে মানবরূপী হায়েনাদের। অথচ কাগজে লেখা হয় এরা নাকি 'সভ্য মানুষ'! আবু গারিবের মত অজানা কত শত বন্দিশালায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান আর ইজ্জত হারিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে সৃষ্টির সেরা বনী আদম। কে রাখে এসব হতভাগা মানুষের খরব? কে পারবে গাণিতিক হিসেব কষে এদের সংখ্যা বের করতে? হ্যাঁ, একজনই কেবল খবর রাখেন এদের। একজনই কেবল বলতে পারেন এদের সঠিক হিসেব। তিনি আর কেউ নন, মহান রাব্বুল আলামীন-'আল্লাহ'। যিনি বড় আদর আর মায়া করে সৃষ্টি করেছেন এ মানবজাতিকে। যিনি নূরের তৈরি ফেরেশতাদেরকে দিয়ে মাটির তৈরি এ জাতিকে সিজদা করিয়ে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ জানান দিয়েছিলেন।

কী দৃশ্য আমার প্রিয় মাতৃভূমির :

একসাগর রক্তের বিনিময়ে বুকভরা আশা নিয়ে এদেশের দামাল সন্তানেরা স্বাধীন করেছিল আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে। মা তার বুকের সন্তানকে বুলেটের সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও জান বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আজাদির নেশায়। কেবল এতটুকু প্রত্যাশায়- এদেশবাসী মুক্ত স্বাধীন হবে, ফিরে পাবে তাদের ন্যায্য অধিকার, নিশ্চিত হবে বেঁচে থাকার জন্য অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ মৌলিক সব অধিকার। বাংলার কৃষক-শ্রমিক খেটে খাওয়া মেহেনতী মানুষ এককথায় সর্বশ্রেণির মানুষ আমাদের গর্বের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ আশায় যে, অন্তত তারা যেন নিজের বিশ্বাস, নিজেস্ব তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ঈমান-আকীদা নিয়ে বসবাস করতে পারে। দু'বেলা অন্তত আহারের জোগাড় নিশ্চিত করতে পারে, বিচারালয়ে গিয়ে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচার পেতে পারে, সুদ ঘুষ দুর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত একটি সুন্দর দেশ যেন গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতাটা কী?

কাকডাকা ভোরে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন, সায়েদাবাদ, গাবতলী, সদরঘাট কিংবা দেশের যেকোন বাস টার্মিনাল কিংবা ফুটপাতের দৃশ্য অবশ্যই একজন হৃদয়বান মানুষকে হতবিহব্বল করে তুলবে। হৃদয়ের গহিনে এক অস্থির প্রপঞ্চ আপনাকে অনিবার্যভাবে বিচলিত করে তুলবে। এ জন্যই কি দেশ স্বাধীন করা হয়েছিল? কোথায় সে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ? কোথায় সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা আর সম্মান?

সৃষ্টির সেরা জীব খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে, মৃতের মত নিঃসাড় নিশ্চল তাদের দেহ, মাথার নিচে নিষ্ঠুর একখণ্ড ইট কিংবা অন্য কিছু। কনকনে শীতের রজনীতে পরনের ছেড়া লুঙ্গিটা দিয়েই যতটুকু সম্ভব আবৃত করে কোন রকমে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।

---

[৬] মুসনাদে আহমাদ, সংকলক-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ.

আর ফুটপাতের সাথে লাগানো পাশের ১০/১৫ তলা ভবনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত কক্ষে নিঃছিদ্র নিরাপত্তায় আনন্দে রাত যাপন করছে ফুটপাতের এ সকল মজুরের সারাদিনের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কষ্টে গড়ে ওঠা শিল্পমালিকরা। 'দুখু মিঞা' তাইতো বলেছিলেন– এ কেমন বৈষম্য? এ কেমন শ্রেণীবিভেদ?

মানবরচিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার এখানেই চরম ব্যর্থতা! সে পারেনি শ্রমিক ও মালিকের মাঝে অর্থের সুষম বণ্টন করতে। বরং উভয়ের মাঝে ক্রমেই সৃষ্টি করে চলছে আকাশ-পাতাল ফারাক। শেষতক এ ব্যর্থ অর্থব্যবস্থা হাল জামানায় সারা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্য লাগামহীন বৃদ্ধিসহ নানা অঘটন ঘটিয়েই চলছে প্রতিনিয়ত। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে, একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে, একজন মুসলমান হিসেবে, রাহমাতুল্লিল আলামীনের একজন উম্মত হিসেবে মানুষে মানুষে এ বৈষম্য ও নির্যাতন আমাদের সহ্য হবার নয়। চিৎকার করে বলছি– আমরা এর আশু সমাধান চাই! মানবরূপী রক্তচোষাদের হাত থেকে আমরা মুক্তি চাই!

প্রাত্যহিক জীবনের আরেকটি চিত্র :

হ্যাঁ, জগৎখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীনের কোন চিত্রের বর্ণনা দিচ্ছি না, বাস্তবতাকে অতিক্রম করেও কিছু বলছি না। শহরের উল্লেখিত এসব স্টেশন, ফুটপাত কিংবা অলি-গলিতে প্রাতঃভ্রমণকালে আপনি এখনও সাক্ষী হতে পারেন। গতরাতে শহরের উঁচু ওয়ালারা বিভিন্ন ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার কিংবা অন্য কোথাও যে সকল অনুষ্ঠান করেছিলেন, সমাজের বঞ্চিত দুর্ভাগা মানুষগুলোর স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজের উচ্চ কোটির অধিবাসীরা খেয়েছেন আর অনুষ্ঠানের উচ্ছিষ্টটা ফেলে দেয়া হয়েছে শহরের নানা ডাস্টবিনে। প্রাতঃভ্রমণকালে আপনার দৃষ্টিগোচর হতে পারে ঐসব ডাস্টবিনে সারি সারি মাছি ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়াচ্ছে, সেখান থেকে একদিকে কুকুর বাছাই করে হাড্ডিগুলো টেনে নিচ্ছে আর অন্যদিকে ফুটপাতের টোকাই কিংবা অর্ধাহারে-অনাহারে জঠরজ্বালা নিয়ে কোনমতে রাত কাটিয়ে দেয়া সমাজের বঞ্চিত আশরাফুল মাখলুকাত বনি আদম অপেক্ষাকৃত ভাল খাবারগুলো ময়লা ঠোঙায় সংগ্রহ করছে। কিংবা ভূখা পেটে সরাসরি উচ্ছিষ্টগুলো চালান করে আপাতত ক্ষুধার আগুন নির্বাপণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

হায়রে মানবতা! হায়রে বনি আদমের মর্যাদা! হায়রে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ! হায়রে মানবতাবাদীদের স্বগর্ব চিৎকার! হায়রে পুঁজিবাদ! হায়রে গণতন্ত্র তথা মানবরচিত যতসব তন্ত্রমন্ত্রের ধারক বাহকদের নির্লজ্জ ব্যর্থ আস্ফালন!

ফিরে দেখুন ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাস :

ইসলাম এক মুসলমানকে তার অপর ভায়ের প্রতি সদয় হওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য এতটাই জোড় দিয়েছে যে, তা এত স্বল্প পরিসরে বর্ণনা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেনঃ জিবরাঈল আ. প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এমনভাবে ওসিয়ত করতে লাগলেন, যাতে আমার ধারণা হতে লাগলো যে, তিনি প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।[৭]

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইমাম শাতবী ও ইমাম গায্যালী র. মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ ১. যরুরীয়াত (Basic needs) ২.হাজিয়াত (Comforts) ৩. তাহসীনিয়াত (Beautification).

এর মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে যরুরীয়াত (Basic needs) বা মৌলিক চাহিদা হল ৬ টি। যথা :

১. আকীদা : বিশ্বাস বা দ্বীন।

২. নফস : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি।

৩. নসল : পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ।

৪. আকল : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা সংরক্ষণ।

৫. মালঃ ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ।

৬. হুর্‌রিয়াতঃ স্বাধীনতা।[৮]

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের এসব যাবতীয় চাহিদা পূরণের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সুনিপূণ, সুসংহত, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত, সুষম, পরীক্ষিত মহান আল্লাহ প্রদত্ত

---

[৭]. বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৫৫৫৫

[৮]. আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা।

বিধানাবলী। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে যার আলোচনা কিছুই করা সম্ভব নয়। নিম্নে কেবল মানবতাবোধ সম্পর্কিত অতি সমান্য কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল।

বিশ্বমানবতার নবী রাসূল সা. ইরশাদ করেন : প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার কথা ও কাজের দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কষ্ট পায় না। [৯]

এক হাদীসে তিনি আরো বলেন : যখন তোমরা তরকারী রান্না কর তখন তাতে একটু বেশী পানি দাও। যাতে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ নিতে পার।[১০]

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন: তিন ধরণের ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ উত্থাপন করব। তাদের মধ্যে একজন হল, যে শ্রমিক খাঁটিয়ে নিজের কাজ আদায় করে নেয়ার পর শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করে না।[১১]

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন : কারো খাদেম বা সেবক তার জন্য খাবার তৈরি করে আনলে সেবককে নিজের সাথে একপাত্রে বসিয়ে খাওয়ানোর মত উদারতা যদি না থাকে. তাহলে অন্তত ঐ খাদ্য থেকে দু'এক লোকমা ঐ সেবককে অবশ্যই দান করবে।[১২]

এক সাহাবী তার ওলীমার দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করতে নবী স. এর নিকট সাহায্য চাইলে নবীজী স. তাকে বলে দিলেন, আয়েশা রা. এর ঘরে একধামা আটা আছে, তা নিয়ে যাও। ঐ ব্যক্তি তা নিয়ে চলে গেল। অথচ নবীজি সা. এর ঘরে এটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[১৩]

নবীজী সা. অমুসলিমের আতিথেয়তাও কুণ্ঠিত হতেন না। হযরত আবু বুশরা নামক এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাতে নবীজী সা. এর অতিথি হয়েছিলাম। তাঁর গৃহে যে কয়টি বকরি ছিল, সবগুলোর দুধ আমি একাই

[৯] বুখারী শরীফ।
[১০]. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-৪৭৫৮
[১১]. বুখারী শরীফ, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং-২০৭৫
[১২]. বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১২১৭
[১৩]. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র., অনুবাদ, বুখারী শরীফ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৮৫

পান করে শেষ করলাম। নবীজী স. পরিবার পরিজনসহ ঐ রাত অনাহারেই কাটালেন। তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হলেন না।[১৪]

হযরত আবু যর রা. তাঁর দাসীকে 'বাঁদীর বাচ্চা' বলে গালি দিলে নবীজী তাকে কঠোর ভাষায় বললেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রয়েছে। এই দাস-দাসীরা তোমাদেরই ভাই-বোন। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করেছেন। তোমাদের কর্তব্য– অধিনস্তদেরকে নিজেদের মত যত্ন সহকারে খাওয়ানো পড়ানো।[১৫]

রোমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধরত হযরত উবায়দাহ রা. এর পরিচালনাধীন ইসলামী ফৌজ সিরিয়ার হিমস নামক স্থানে অবস্থান করছিল। সেখানকার অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া বা নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা কর আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে খলীফার নিকট থেকে নির্দেশ এলো ইসলামী বাহিনীর সকল সৈনিককে ইয়ারমুক রণক্ষেত্রে সমবেত হতে। কারণ সেখানে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি হযরত আবু উবায়দাহ নির্দেশ জারি করলেন, সেনাবাহিনী স্থানান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ইয়ারমুখ পানে রওয়ানা হয়ে যেতে। সাথে সাথে এ হুকুমও ঘোষণা করলেন, অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের নিকট থেকে গৃহিত জিযিয়া ফেরত দেয়া হোক। কোষাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন, একটি পয়সাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ঈহুদী-খৃষ্টান নাগরিকদের থেকে গৃহিত অর্থ ফেরত দেয়া হলে তারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলো, এমানটা করা হচ্ছে কেন? সেনাপতি আমিনুল উম্মাহ উত্তর দিলেন, আপনাদের থেকে এ কর উত্তলন করা হয়েছিল এ কারণে যে, আমরা আপনাদের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করব। আমরা এখন অনিবার্য কারণে সে দায়িত্ব পালনের অবকাশ পাচ্ছি না। কারণ আমরা এখন অন্য ফ্রন্টে অভিযানে আদিষ্ট হয়েছি। আবার কবে পর্যন্ত এখানে ফিরে আসা হবে তা নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা নেই। সুতরাং আপনাদের নিকট থেকে গৃহিত অর্থ রাখার অধিকার আমাদের নেই।

[১৪]. প্রাগুক্ত।
[১৫] বুখারী শরীফ, অনুবাদ- মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র., খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৮৭

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সেনাপতির জবাব শুনে সেই বিধর্মী লোকেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহ তোমাদের আবার ফিরিয়ে আনুন। তারা তাদের পুরাতন মুনিবদের তুলনায় মুসলমানদের শাসনাধীন থাকাকে প্রাধান্য দিত। তারা বলত, ওরাতো আমাদের নিকট থেকে ভারি ট্যাক্স উসুল করত এবং আমাদের রক্ত শোষণ করতো। অথচ আমাদের সাথে তোমাদের আচরণ এই দেখলাম![১৬]

মানবতার কেন এই করুণ পরিণতি :

মানবতার এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কে? আমাদেরকেই চিহ্নিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার এ প্রিয় সৃষ্টি মানবজাতি অশান্তিতে থাক, তিনি কখনোই তা চান না। তবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি কোন জাতি বা ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে বিনা কারণে অশান্তি,হিংসা, হানাহানি ছড়িয়ে দেন না। করেন না কোন জাতিকে লাঞ্চিত আর বঞ্চিত। إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটায়। সূরা র'দ:১১

অন্যত্র ইরশাদ করেন : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

অর্থাৎ-জলে স্থলে ফেতনা ফাসাদ– এ কেবল মানুষেরই কৃতকর্মের ফসল। সূরা আর রূম: ৪১

কালামে পাকের এ সকল ঘোষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সমাজের যাবতীয় বিশৃংখলা, মানবতার চরম লাঞ্চনা-বঞ্চনা, শোষণ-অত্যাচার-অবিচার নিপীড়ন সবই আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষিত কোন মৌলিক নীতি লঙ্ঘনের ফসল।

কি সেই মৌলিক নীতি :

আল্লাহ পাককে রব বা প্রভূ বলে স্বীকার করে নেয়া। আজকে দুনিয়ার মানুষ প্রভূ বা মাওলা হিসাবে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রভূর আসনে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে আসীন করেছে। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বদলে মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। নামে মুসলমান হয়ে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের

[১৬]. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাচ্যের উপহার, ইফাবা, পৃ:৭৪

মধ্যে দাসত্ব স্বীকার করলেও বাকী সকল সময় দাসত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে মানুষের। মুখে কালেমা স্বীকার করলেও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ উল্টো। এ অবস্থা থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। (তবে হ্যাঁ, যারা এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কথা ভিন্ন)। আর এ কারণেই সমাজে যতসব বিশৃংখলা।

গণতন্ত্রের ধুম্রজালের মধ্যে এর প্রমাণ:

বর্তমান বিশ্বে চলছে গণতন্ত্রের চরম হৈ হৈ অবস্থা। এই সুবাদে গণমানুষের অধিকার রক্ষায় ভোটাধিকার নিশ্চিত করণের মুখরোচক বক্তব্য প্রদান করে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা পুঁজিপতিদেরকে মন্ত্রী-এম পি বানিয়ে গণমানুষকে প্রভূর আসনে আসীন করাচ্ছে। এ সকল পুঁজিপতির বক্তব্যের ধুম্রজালে ঘুরপাক খেয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ, গণমানুষ যখন প্রভূ হিসাবে মহান আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তারই সৃষ্ট মানুষকে মনের অজান্তেই প্রভূ হিসেবে মেনে নিচ্ছে, তখনই দেশে দেশে মানবতার উপর অত্যাচার অনাচারসহ যতসব নির্যাতন আর বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে।

বাস্তব উদাহরণ:

সাধারণ কথায় আমরা প্রভূ বলতে বুঝি–যিনি আমাদের লালন পালন করেন, যার কথা বা নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের চলতে হয়। যার আইন অমান্য করা অসাধ্য ব্যাপার, যিনি তার ইচ্ছা বা মর্জি মোতাবেক আইন রচনার অধিকার রাখেন এবং যার আইন অমান্য করা অপরাধ। এক কথায় যার গোলামী করা হয়।

একজন মুসলমান হিসাবে উপযুক্ত এ সকল উপাধিতে একমাত্র উপাধেয় করা যায় মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালাকে। এটাই হল ঈমানের মূল দাবী, কালেমায়ে তায়্যেবা এর মূল কথা। এ কথা থেকে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ সরে আসলে ঈমানের উপরেই আশংকা চলে আসে। অথচ আমাদের বর্তমান বাস্তবতটা কী?

কী সেই আসল বাস্তবতা?

প্রচলিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধোঁকা তো আসলে এখানেই। আমরা ভোটের অধিকার পেয়েই আনন্দে আত্মহারা। অথচ এ পথ বেয়েই আমাদের ভোট নিয়ে আমাদের মত রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরাই আমাদের প্রভূ সেজে আমাদের ঘাড়ে জেঁকে বসছে। আমাদের ভোট নিয়ে তারা হচ্ছে এম পি বা জাতীয় সংসদ সদস্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

ভাষায় এ জাতীয় সংসদই হল 'আইন পরিষদ'। সকল এম পি মন্ত্রী হলেন আইন পরিষদের সদস্য। এদের মূল কাজই হল আইন রচনা করা। নতুন নতুন আইন পাশ করা। এখানে বসে তারা যেকোন আইন রচনা করার এখতিয়ার রাখেন। এ সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে এক মতে পৌঁছলে ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমির জন্য যা খুশি সে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা রাখেন। এমনকি এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না- তারা যদি এ ব্যাপারে আইন প্রনয়ণ করেন যে, আগামীকাল ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে দিন না বলে 'রাত' বলতে হবে- তবে বাংলাদেশের জনগণ এ সময়কে 'রাত' বলতে বাধ্য। এরকম তাদের সুবিধাজনক যেকোন আইনই রচনা করার ক্ষমতা এসব মানব রূপী প্রভূরা রাখেন।

এ সম্পর্কিত আরো বাস্তবসম্মত উদাহরণ সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের জনগণ বেশ চমৎকারভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। আওয়ামী সরকার তাদের ইচ্ছামত এদেশের সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে তুলে দিল। অথচ এটা ছিল এদেশের সর্বসাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও পবিত্র বিশ্বাসের সম্পূর্ণ উল্টো। একেই বলে মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব।

চির সত্য হল: ইসলাম এমন কোন ক্ষমতা মানুষকে আদৌ দেয়নি। আইন রচনার একমাত্র মালিক বা অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীন।

এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলः আল্লাহ পাক হুশিয়ারী করে দিয়ে বলেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

অর্থাৎ-সাবধান! জেনে নাও সৃষ্টি যার আইনও চলবে তার। (সূরা আ'রাফ: ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ অর্থাৎ- আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা। (সূরা ইউছুফ: ৪০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)

অর্থাৎ-তারা কি জাহেলী যুগের আইন চায়? অথচ শান্তিকামীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম সংবিধান প্রণয়নকারী আর কে আছে! (সূরা মায়েদা: ৫০)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

তোমরা মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচার কর, তোমাদের নিজ মনোবৃত্তির অনুসরণ করবে না। (সূরা মায়েদাः ৪৯)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ... الظَّالِمُونَ .... الْفَاسِقُونَ

অর্থাৎ-যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না। তারা কাফের...জালেম...ফাসেক। (সূরা মায়েদা: ৪৪, ৪৫, ৪৭)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে একথা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আইন রচনার অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কারো ভাগ বসানোর প্রচেষ্টা সরাসরি শিরকের নামান্তর।

কেননা আল্লাহ পাক ভাল করেই জানেন- মানুষের কোন পথে কল্যাণ আর কোন পথে ক্ষতি। অপরদিকে কোন মানুষ নিশ্চিত করে এ ভলো-মন্দের কথা বলার অধিকার বা ক্ষমতা রাখে না। কারণ তাদের জ্ঞান একান্তই সীমিত। এজন্যই মহান আল্লাহ আইন রচনার অধিকার কোন মানুষের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। তিনি খুব ভাল করেই জানেন মানুষের হাতে এ ক্ষমতা ছেড়ে দিলে মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আইন রচনা করবে। অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য শোষণ, নির্যাতন করে প্রয়োজনে জোকের মত দুর্বলের রক্ত চুষে নিতে তদের পিলে মটেই কম্পমান হবে না।

বাস্তবতা আজ তাই হচ্ছে। ইসলাম যেখানে মানবকল্যাণে সুষম বন্টন ব্যবস্থা, করজে হাছানা ইত্যাদি ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ঘোষণা করেছে, সেখানে পাঁচ তলার মালিক এম পি আজ এমন আইন করছে যার দ্বারা দশ তলার মালিক হওয়া যাবে। সূদের হার বাড়িয়ে গরিবের টাকা জমা করে কিভাবে পুঁজিপতি হওয়া যাবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহুদীদের ক্রিড়ানক হয়ে মদকে হালালের লাইসেন্স প্রদান করছে। অবৈধ পথে অর্জিত কালো টাকা সাদা করার আইন পাশ করে নিচ্ছে। আমরা ভেবে দেখেছি কি এ কালো টাকা সাদা করার দ্বারা এদেশের খেটে খাওয়া গরীব দুঃখীর আদৌ কোন ফায়দা আছে কী? যারা আজ সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে মন্ত্রী-এমপিরা ওদের পক্ষেই যতসব আইন রচনা করেই চলছে। সাধারণ গোবেচারা মানুষদের নিমিত্তে কেবল চলছে কিছু আইওয়াশ।

এ সবই করছে মানবরূপী ঐ সব প্রভূ, যাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে প্রভূর আসনে আসীন করেছি। মিডিয়ায় এদেরকেই জনদরদী, মানবদরদী ইত্যকার ভূষণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত করা হয় প্রতিনিয়ত।

কোথায় আমাদের ইহকালীন কল্যাণ? কোথায় আমাদের ঈমান? আমরা যারা এ সকল মানুষকে আমাদের আইনদাতা প্রভূ হিসাবে মেনে নিয়েছি, আমাদের এ কাজকেই রাসূলুল্লাহ সা. শিরক বলে ঘোষণা করেছেন এবং আমাদের মত অনুসারীদেরকে মুশরিক হিসেবে গণ্য করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট একটি কাফেলা এসে কথা বলতে থাকলে একপর্যায়ে রাসূল সা. তৎকালীন খৃষ্টানদের সম্পর্কে কালামে পাকের আয়াত উল্লেখ করে বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ-তারা তাদের ধর্মীয় নেতা ও সন্যাসীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবা: ৩১) কেননা এসকল ধর্মীয় নেতা যাকে হালাল বলত, তারা তাকে হালাল মনে করে আর যাকে হারাম বলে তারা তাকে হারাম মনে করে।

অতএব আমাদেরকেও ভেবে দেখতে হবে- তথাকথিত প্রচলিত গণতন্ত্রের গোলকধাঁধায় পড়ে আমাদের মন্ত্রী, এমপিদেরকে কোন আসনে আসীন করে রেখেছি এবং আমাদের ঈমানের অবস্থাটাই বা কী?

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে- ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তখন কি মন্ত্রী এমপি থাকবে না? আর থাকলে কি তখনও তারা এই একই প্রক্রিয়ায় প্রভূর আসনে আসীন হবে না? তাদের কি আইন রচনার অধিকার থাকবে না? উদ্ভাবিত নব নব সমস্যার সমাধানে নব নব আইন রচনার প্রয়োজন হবে না?

উত্তরটা সহজভাবে বলতে গেলে এভাবে বলতে হয়: তখন প্রয়োজনে মন্ত্রী এমপি সবই থাকবে, নব নব সমস্যার সমাধানের জন্য আইন রচনার অধিকারও তাদের থাকবে। তবে পার্থক্যটা হলো, এখনকার মন্ত্রী- এমপিগণ তাদের মন মত, তাদের সুবিধা মত আইন রচনার এখতিয়ার রাখেন। কিন্তু ***ইসলামী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রী এমপিগণ সব সমস্যার সমাধান করবেন ইসলামের মূল চার ভিত্তি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে। যদি কোন আইন রচনাও করতে হয়- তাও হতে হবে এই চার মূলনীতির আলোকে। কাজেই এখানে মনগড়া কোন আইন রচনার ক্ষমতা কোন মানুষ বা কোন সংসদ সদস্যের থাকবে না।*** এ চার মূলনীতি যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল স. স্বীকৃত ও নির্দেশিত সেহেতু এখানে বিশৃংখলা বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির কোন সুযোগই থাকবে না। প্রকারান্তরে এ সকল মন্ত্রী- এমপি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. বিধান অনুযায়ীই সমাজকে পরিচালনা করবেন। তখন এরা মানুষের 'প্রভূর' আসনে আসীন হওয়ার পরিবর্তে মহান আল্লাহর আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করার কারণে তাঁরা সমাজের খাদেম হিসাবে বিবেচিত হবেন।

যার দৃষ্টান্ত খোলাফায়ে রাশেদীন–হযরত আবূ বকর রা., হযরত ওমর রা. হযরত ওসমান রা. হযরত আলী রা. সহ যুগে যুগে ইসলামের মহান খলীফাগণ জগতবাসীর সামনে রেখে গেছেন। ইসলামের এ সকল মহান খলীফা বিশাল বিশাল অট্টালিকার পরিবর্তে উন্মুক্ত গাছতলায় বিশ্রামকেই অধিক পছন্দ করতেন। নিজের আরাম আয়েশ আর কালো টাকা সাদা করার পরিবর্তে রাতের আঁধারে দুঃখিনী প্রজাদের ঘরে আটার বস্তা বহন করে পৌঁছে দেয়াটাই বড় দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এ সকল খলীফার মন্ত্রী-গভর্নরদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা তো দূরের কথা ন্যূনতম অভিযোগের দৃষ্টান্তও বিশ্বইতিহাস খুঁজে দিতে পারবে না। তারা গাড়ি কিংবা ঘোড়ার বহর নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বিচরণের পরিবর্তে সাদা-মাটা স্বাভাবিক বিচরণকেই অধিক পছন্দ করতেন। তাঁরা ছিলেন ইলমে ওহীর আলোকস্নাত, ইসলামের জ্যোতির্লোকে চির উদ্ভাসিত। ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লিখা হয়েছে এঁদের শত সহস্র কালজয়ী ঘটনাবলী।

✍ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁর ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে পরিবার পরিজনকে বললেন, অনুসন্ধান করে দেখ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমার সম্পত্তি কোন প্রকারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল খলীফা হওয়ার পর

তাঁর একটি হাবশী সেবক, যে শিশুদের দেখা-শুনা এবং মুসলমানদের তরবারী পরিষ্কার করত, পানি আনার একটি উষ্ট্রী এবং এক টাকা চার আনা মূল্যের একটি চাদর বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসাব শুনে নির্দেশ দিলেন আমার মৃত্যুর পর এগুলো পরবর্তী খলীফার নিকট পৌঁছে দিও।

ইন্তেকালের পর উপর্যুক্ত বস্তুগুলো হযরত ওমরের রা. নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন 'হে আবু বকর আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন করে গেলেন'। (জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ, পৃ: ৩৫)

✍ তখনও হযরত ওমর রা. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তাঁর বসতির অনতি দূরেই ছিল এক বৃদ্ধার বসবাস। বয়সের ভারে ন্যুজ বৃদ্ধা ছিল কাজেকর্মে একেবারেই অক্ষম। তাই দয়া পরবশ হয়ে হযরত ওমর রা. প্রতিদিন উপস্থিত হতেন বৃদ্ধার গৃহস্থলীর কাজ আঞ্জাম দেয়ার মহানুভবতা নিয়ে। কিন্তু এসেই দেখতে পেতেন তিনি পৌঁছার অনেক পূর্বেই কে যেন বাড়ির যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে রেখে গেছেন। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। যেন কার নির্ভেজাল সেবা আর অবারিত আন্তরিকতায় ঝলমল করছে বৃদ্ধার জীর্ণ কুটির। কিন্ত কে সে? অনেক প্রশ্ন করেও তার সঠিক পরিচয় জানতে ব্যর্থ হলেন হযরত ওমর রা.। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঠিক করে বলতে পারতেন না কে তার কাজ প্রত্যেহ গুছিয়ে দিয়ে যায়? খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর দিন হযরত ওমর রা. বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে দেখেন আজ আর তার বাড়ি প্রতিদিনের মত নয়। হযরত ওমরের এখন আর বুঝতে বাকী রইল না, এতদিন এ বৃদ্ধার যাবতীয় কাজ কে গুছিয়ে দিতেন।

তিনি আর কেউই নন, রাসূল সা. এর একান্ত আপনজন, গারে ছওরে তাঁর একান্ত সাথী এ উম্মতের সায়্যেদ বা নেতা, ইসলামী জাহানে রাসূল সা. এর প্রথম খলীফা, ইসলামী রাষ্ট্রে রাসূল সা. এর পর প্রথম প্রেসিডেন্ট হযরত আবু বকরই রা. রাষ্ট্রীয় শত ব্যস্ততার পরও নিজ হাতে এত দিন এ বৃদ্ধার গৃহস্থলির যাবতীয় কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন।

✍ হযরত ওমর রা. এর প্রতাপের কথা কে না জানে? রাসূল সা. বলেছেন, আমার ওমর যে রাস্তায় চলে অভিশপ্ত মহাচতুর ইবলিসও সে পথে চলতে সাহস পায় না। তাঁর প্রতাপ এমন ছিল যে, তাঁর সেনাদল ইরানের দূর্ধর্ষ 'শাসানী' সম্প্রদায়ের রাজসিংহাসন উল্টে দিয়েছিল। তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম পারস্যের সম্প্রাটদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ও খালিদ বিন ওয়ালিদের মত জগৎ বিজয়ী সেনাপতিদের কাছে কৈফিয়াত তলব করলে মাথা উঁচু করে যাঁর সামনে কথা বলার সাহসটুকু পেত না, সেই আধা জাহানের বাদশাহর সরলতার একটি মাত্র উদাহরণ লক্ষ করুন:
কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য সম্রাট রাজ্যের সর্বশক্তি যুদ্ধের ময়দানে নিয়োগ করেছিলেন। একদিনের যুদ্ধের দশ হাজার ইরানী ও দুই হাজার মুসলিম সৈন্য হতাহত হন। যুদ্ধ চলাকালে হযরত ওমরের অবস্থা ছিল, প্রত্যেহ সূর্যদয়ের সাথে সাথে মদীনার বাইরে প্রচন্ড গরমে কোন বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে কাদেসিয়ার সংবাদবাহী কাসেদের পথ চেয়ে থাকতেন। একদা হযরত সা'দ রা. এর কাসেদকে যুদ্ধের খবর নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে মদীনা পানে আসতে দেখলেন। বার্তাবাহক ছুটে চলছে আমীরুল মুমিনীনকে সর্বশেষ সংবাদ জানাতে। বার্তাবাহক খলীফাকে না চিনলেও হযরত ওমর রা. তাকে চিনতে পেরে ইনিয়ে বিনিয়ে যুদ্ধের ময়দানের যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। কাসেদ উট হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন আর হযরত ওমর উটের রেকাব ধরে কাসেদের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছিলেন। শহরের অভ্যন্তরে পৌঁছার পর কাসেদ যখন শুনতে পাচ্ছিলেন তাঁর উটের সাথে সাথে দৌড়ানো লোকটিকে মদীনাবাসী অতি সম্মানের সাথে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্মোধন করছে, তখন কাসেদতো রীতিমত হতবাক।
বার্তাবাহক দারুণভাবে বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। ইনিই আল্লাহর রাসূলের সা. খলীফা! কাসেদ বিনীত ভাবেনিবেদন করলেন- আমীরুল মুমিনীন, আপনি পূর্বে কেন

আমাকে পরিচয় দেননি? তাহলে আমাকে এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে হত না। আমায় মাফ করবেন। হযরত ওমর রা. বললেন, এসব বলো না। আসল খবর বলতে থাক। কাসেদ তাই বলতে লাগলেন আর তিনি পূর্বের মতই উটের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌঁছলেন।[১৭] এটাই হল ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মহান খলীফা, শাসক বা প্রেসিডেন্টদের চিত্র।

এ সবই সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানদের হাতে মনগড়া আইন রচনার ক্ষমতা থাকে না। তারা নিজেদেরকে দেশের জনসাধারণের প্রভূ মনে না করে সেবক মনে করতেন বা করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা বা জনগণ তাদের শাসকদের দাসত্বের পরিবর্তে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের দাসত্বকেই স্বীকার করে নেয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলারই আইনের অনুসরণ করে থাকে। এমনটা নয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে কেবল আল্লাহ পাকের বিধান অনুসরণ করবে আর রাষ্ট্রের সকল কাজে মানবরচিত কোন আইন মেনে চলবে। এরকম প্রভূত্বের কোন অংশীদারত্ব ইসলাম মেনে নেয় না। ফলে কোন মুসলমানও তা মেনে নিতে পারে না। মুমিনের ঈমানের দাবীও এটাই।

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সফলতা, সৌন্দর্য এখানেই। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদী মানবরচিত সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা আর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মঝে মৌলিক পার্থক্যই হল- মানবরচিত এসব রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের জন্য তারই মত রক্তে মাংসে গঠিত হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতর-অহংবোধ-একান্ত সীমিত জ্ঞান ইত্যাদী মানবীয় দুর্বলতা সম্পন্ন আরেক মানুষকে তার প্রভূর আসনে অধিষ্ঠিত করে তাকে শাসনের দায়িত্ব দিয়ে থাকে। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন রচনা, মূল শাসক বা প্রভূর আসনে আর কেউ নয় মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বনিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহকে বাস্তবার্থেই অধিষ্ঠিত করা হয়, জ্ঞান করা হয় বা মেনে নেয়া হয়। শাসকবর্গ মহান আল্লাহর বিধি-বিধান রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট। মনগড়া আইন প্রণয়নের কোন এখতিয়ার তাদের হাতে থাকে না। ফলে সর্বত্র কাঙ্খিত শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে খুব সহজেই।

বিশ্বমানবতার ইহকালীন শান্তি আর পরকালীন মুক্তির দূত মহান রাসূল সা. দুনিয়াতে এসেছিলেন এ মহান মিশন নিয়েই। রাসূলল্লাহ সা. এর সেই মহান মিশন থেকে সরে দাঁড়ালে একদিকে যেমন মুসলমান হিসাবেও দাবী করা সম্ভব নয়; সাথে সাথে বিশ্বশান্তির আশা করাও সুদূর পরাহত। এ মহান মিশনের আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে পরিচালনা করলেই কেবল মানবতার মুক্তি আসতে পারে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে অশান্তি, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ, শ্রেণীবৈষম্য, কায়েমী স্বার্থবাদ সব কিছুই দূর হতে পারে। প্রতিষ্ঠা হতে পারে সমাজের সকল শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার। সর্বোপরী গোটা বিশ্ব এক শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। যেখানে শান্তি সুখের সফেদ পায়রা উড়ে বেড়াতে পারে অনায়াসে অনাদীকাল ব্যাপী। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বা ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রাসূলে পাক সা. আনীত কল্যাণময় ইসলামী জীবনব্যবস্থা সর্বত্র প্রতিষ্ঠার সেই মহান মিশনের দিকেই আহ্বান জানাচ্ছে।

আসুন, মানবতার ইহকালীন প্রত্যাশিত শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন মুক্তির জন্য স্থায়ী সমাধান ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে নিজেকে সর্বতভাবে শরীক করি।

[১৭]. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী।